উপরি বায়ুমণ্ডল কি ?

রচনা : হায়ানন

অনুবাদ : রজত আচার্য্য

কেন উচ্চতার সঙ্গে বাতাস পাতলা হয়ে আসে?

তোমরা জানো উচ্চতার সঙ্গে বাতাস পাতলা হয়ে আসে। এই কারণেই অধিক উচ্চতায় আমাদের নিঃশাস নিতে কষ্টবোধ হয়। উদাহরণস্বরূপ, মাউন্ট ফুজির শিখরে (৩৭৭৬ মি) বাতাস সমুদ্রতলের তুলনায় মাত্র ২/৩ ভাগ। তোমাদের কখনো ভেবেছো যে এমনটা কেন হয়?

কারণটা পৃথিবীর মহাকর্ষ বলের সঙ্গে সম্বন্ধীয়। আমরা এখানে সেটা এবার বুঝবো। যদিও বাতাস খুব হালকা, তবুও তার উপর থাকে নিম্নগামী মাধ্যাকর্ষণ। তাহলে কি সব বাতাস নিচে নেমে আসে? চিন্তার কিছু নেই। কারণ, বাতাসের অণুকণাগুলি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এলোমেলো ভাবে ছুটে বেড়ায় আর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে এক বল সৃষ্টি করে। প্রতি একক বর্গক্ষেত্রে এই বলকে বাতাসের চাপ বলা হয়।

ভূমিপৃষ্ঠে এই চাপের পরিমান ১ কেজি প্রতি বর্গসেন্টিমিটার। সোজা কোথায়, তোমার বুড়ো আঙুলের উপর সম্পূর্ণ বাতাসের ভার প্রায় ১ কেজি। তা সত্বেও আমরা চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাই না, কারণ আমাদের শরীরের মধ্যে থেকে সমান চাপ বাইরের দিকে রয়েছে।

আমাদের এই পৃথিবী, বাতাসের এক স্তুপের তলায় চাপা রয়েছে। ভূমিপৃষ্ঠের বাতাসের উপর এই চাপ বেশি, তাই এখানে বাতাস ঘন ও ভারী কিন্তু বেশি উচ্চতায় এই চাপ কম থাকায়, বাতাস কম ঘনীভূত ও হালকা। এই কারণে আমরা যত উচ্চতায় উঠি, বাতাস ততো পাতলা হয়ে আসে।

তোমরা দেখবে, এটি উচ্চতায় হালকা বাতাসের চরিত্রগুণ আমাদের ভূপৃষ্ঠের বাতাসের থেকে আলাদা। এখানকার বাতাস তড়িৎ আধানযুক্ত, এদের গঠন পরিবর্তনশীল এবং তারা আলোকও নির্গত করে। এই রকম অনেক রহস্যে ভরা উপরি বায়ুমণ্ডল, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আর মহাকাশের মাঝের সীমানা।

মোল আর মিরুবো এবার উপরি বায়ুমণ্ডলের কথা জানতে অভিযানে বেরোচ্ছে। চলো আমরাও ওদের সঙ্গে যোগ দিই।

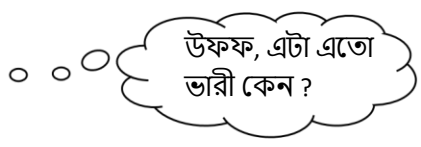

আজ ছুটির দিন
বিজ্ঞান প্রেমী মোল আর তার রোবট কুকুর মিরুবো হালকা মেজাজে আকাশের দিকে চেয়ে আছে।
আকাশটা কত সুন্দর, তাই না রে?
পরিষ্কার আকাশ সবচেয়ে সুন্দর

মিরুবো, আকাশের উপরি ভাগটা কেমন দেখতে রে?
আকাশের উপর?
এই মেঘের চেয়ে অনেক ওপরে কিন্তু মহাকাশের নিচে।
হ ম ম ম, মানে আকাশের অন্তিম প্রান্তে ?

আমার এই সুপার কম্পিউটার মগজ সত্ত্বেও এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব।
চলো, আমরা একসাথে আকাশের উপরের ব্যাপারে জানি।
ধন্যবাদ, শিক্ষক মশায়।

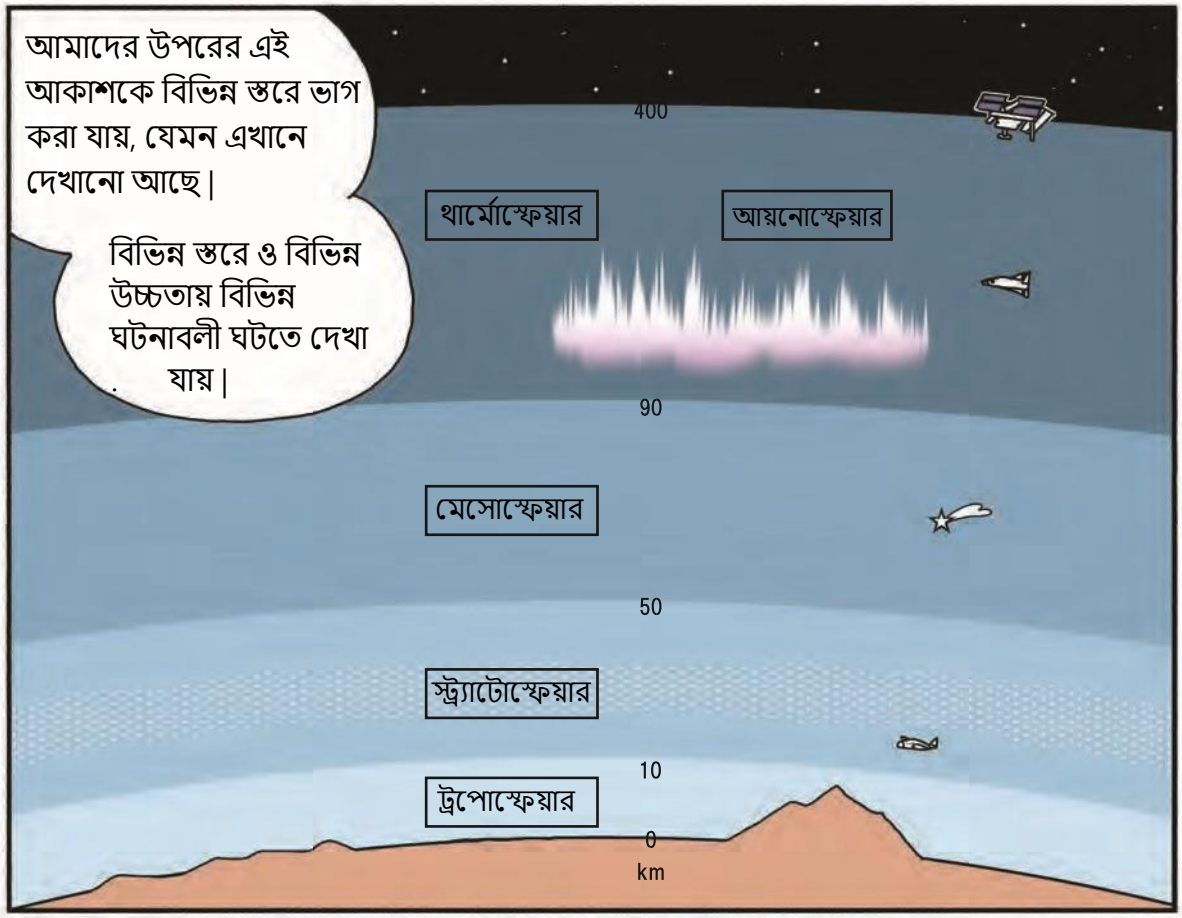
আমাদের উপরের এই আকাশকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়, যেমন এখানে দেখানো আছে।
বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন ঘটনাবলী ঘটতে দেখা যায়।
400
থার্মোস্ফেয়ার
আয়নোস্ফেয়ার
90
মেসোস্ফেয়ার
50
স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার
10
ট্রপোস্ফেয়ার
0
km

আজ তোমরা উপরি বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে জানবে। আমরা উপরি মেসোস্ফেয়ার ও থার্মোস্ফেয়ার / আয়নোস্ফেয়ার কে বলে থাকি উপরি বায়ুমণ্ডল
আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।
তাহলে উপরি বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত উড়ে যাওয়া যাক।

উহ এখানে উপরে তো ঠান্ডা বেড়ে যাচ্ছে।
আমরা তো জানি যে পাহাড়ের যত উপরে উঠি ঠান্ডা বেড়ে যায়।
ট্রপোস্ফেয়ারে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত যত উচ্চতায় উঠবো ঠান্ডা বেড়ে যাবে।
একদম ঠিক, মোল। ৫০ কিমির উপর, মেসোস্ফেয়ারে, ওজোনের পরিমান আবার কমে আসে
আর সেই সঙ্গে বাতাসের তাপমাত্রাও কমতে থাকে।
মেসোস্ফেয়ারের উপরিভাগে, তাপমাত্রা কমে পৌঁছে যায় -৯০ ডিগ্রী তে।
এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে ঠান্ডা স্থান।
১০ কিলোমিটারের উপর, স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারে ঢুকলে, বাতাসে ওজোনের পরিমান বেড়ে যায়।
এবার একটু উষ্ণ বোধ হচ্ছে।
ওজোন স্তর বাতাসকে উত্তপ্ত করে তোলে। তাই না?
থার্মোসফেয়ারে, ওজোন ছাড়া অন্যান্য পদার্থ, সূর্যের আলোর সাথে আসা অতিবেগুনি (ইউ.ভি.) রশ্মি শোষণ করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
এখানকার তাপমান গিয়ে দাঁড়ায় ১০০০ ডিগ্রী পর্যন্ত।
১০০০ ডিগ্রী ?
আমরা তাহলে ওখানে যাচ্ছি না।
ওখানে তো পুড়ে ঝামা হয়ে যাবো।
চিন্তা করো না।
১০০০ ডিগ্রী শুনলে অনেক গরম মনে হয়, কিন্তু বাতাসের ঘনত্ব এখানে অত্যন্ত কম যে...
...আমরা সেই তাপ বুঝতেই পারবো না। যদিও একটা অনুর তাপমান ১০০০ ডিগ্রী, কিন্তু পুরো বাতাস এখানে গরম নয়।
এই অনুর তাপমান ১০০০ ডিগ্রী।
সূর্যের সক্রিয়তা এবং দিন/রাতের পার্থক্য .....
...৫০০ থেকে ২০০০ ডিগ্রী পর্যন্ত তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

আমরা যত ওপরে যাবো, বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যাবে ।

মেসোস্ফেয়ারে এই গতিবেগ কিছু মিটার প্রতি সেকেন্ড থেকে বেড়ে ..

থার্মোসফেয়ারে এই গতিবেগ হয়ে যায় ১০০ মিটার প্রতি সেকেন্ড থেকেও বেশি।

আমি তো বাতাসের এতো গতি বুঝতে পারছি না। কেন?

ঠিক যে কারণে এখানকার তাপমাত্রা বোঝা যাচ্ছে না, সেই একই কারণে।

বাতাসের অত্যন্ত অল্প ঘনত্বের জন্য, আমরা বাতাসের এই উচ্চ গতিবেগ এখানে বুঝতে পারি না, যা আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে পারতাম।

বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন ধরণের বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়।

তাদের মধ্যে এক প্রকার হলো, বায়ুমণ্ডলীয় জোয়ার।

ঠিক যেমন সমুদ্রে হয়, এই প্রবাহে, উপরি বায়ুমণ্ডলেরও উত্থান-পতন হয়।

এই বায়ুমণ্ডলীয় জোয়ার যে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি করে, তা পৃথিবীর দিনার্দ্ধের থেকে রাত্রার্দ্ধের দিকে বয়ে যায়।

আর কারণ সূর্যের তাপে দিনের দিকের বাতাসের সম্প্রসারণ হয়।

অর্থাৎ, সকালবেলায় এই বায়ু পূর্ব থেকে পশ্চিমে বয়

পূর্ব দিক

পশ্চিম দিক

এবং বিকেলে এই বায়ু বয় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে।

পূর্ব দিক

পশ্চিম দিক

আর আছে, গ্রহগত তরঙ্গ। এই তরঙ্গের স্ফিতি সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে যায়।

বিশাল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এই তরঙ্গের পর্যায়কাল কিছুদিন থেকে শুরু করে কয়েক দশেক দিন পর্যন্ত হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, এই গ্রহগত তরঙ্গ, পৃথিবীর কোনো কোনো জায়গায়, বেশ কিছুদিনের গরম ও ঠান্ডা দিনের পর্যায়ক্রম তৈরি করে।

সেই সঙ্গে, দশ মিনিট থেকে কিছুদিনের পর্যায়কালীন বায়বীয় দোলান কে বায়ুমণ্ডলীয় অভিকর্ষ তরঙ্গ বলা হয়।

উদাহরণ হিসাবে, যখন পুঞ্জমেঘ উর্ধগতি হয় বা পর্বতের গা বেয়ে বায়ু বয়, তখন বাতাস উত্তোলিত হয়।

হওয়ার এই অংশ উপরে উঠে এলে, তার উপর চাপ হ্রাস পায় ও এই কারণে বাতাস সম্প্রসারিত হয়।

এই সম্প্রসারণের জন্য বাতাসের এই অংশের তাপমাত্রাও হ্রাস পায় ও তাদের ঘনত্ব বেড়ে যায়, এবং এই কারণে তারা আবার নীচে নেমে আসে।

নীচে আসা বাতাসের তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকে, ও সঙ্গে তার উপর চাপ বেড়ে যায়। সেই কারণে এরা আবার আবার উপরে উত্থিত হয়।

এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে আর বাতাস উপরে ও নীচে, উপরে ও নীচে হতে থাকে।

এই অভিকর্ষ তরঙ্গ পৌঁছে যায় মেসোস্ফেয়ারের শীর্ষে, যেখানে এই তরঙ্গ বিনষ্ট হয়ে তৈরি হয় তাপ ও শক্তি।

এই অভিকর্ষ তরঙ্গের শক্তি এতোই হতে পারে যে তারা মেসোস্ফেয়ারের দীর্ঘ পাল্লার বায়ু প্রণালীর পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

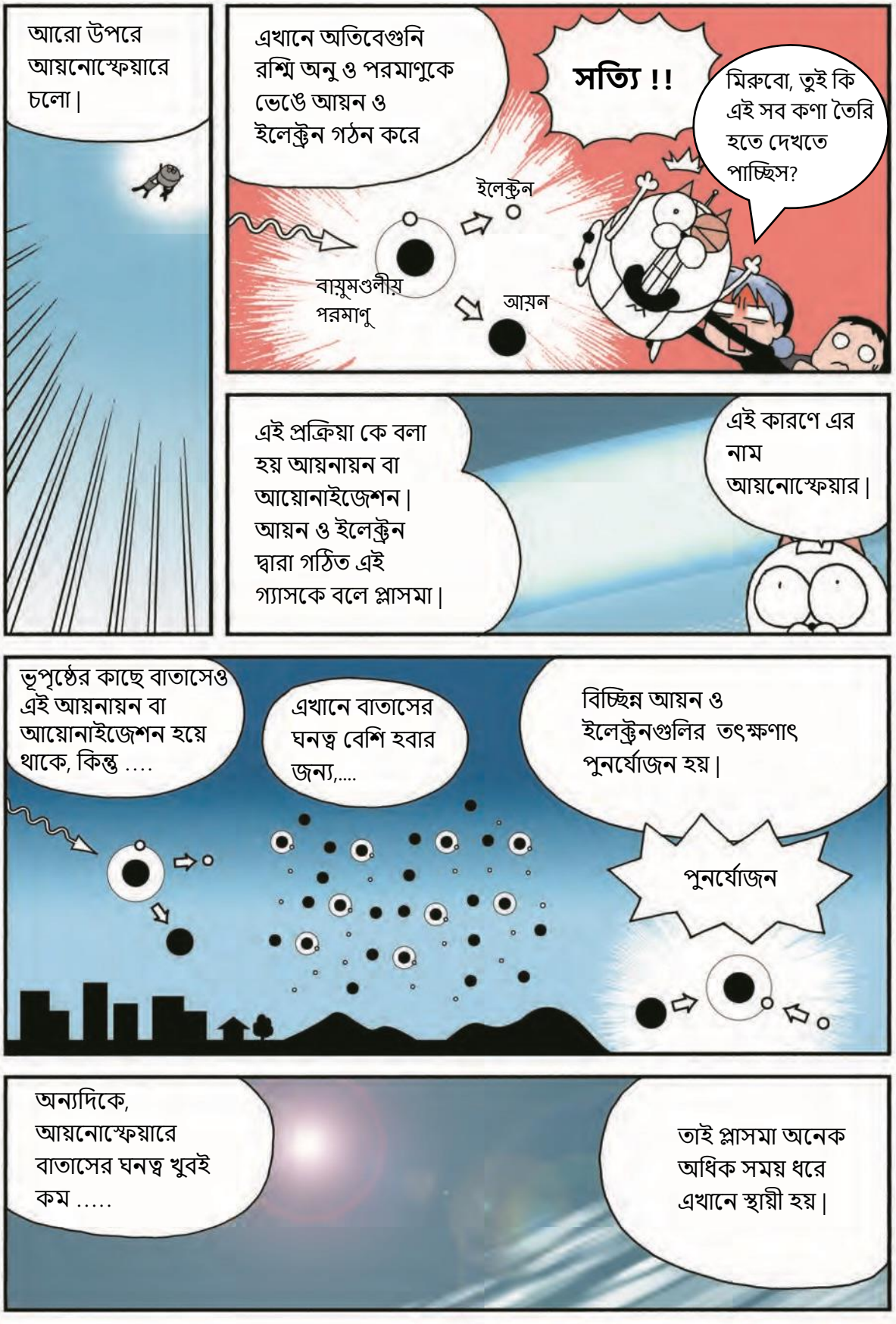
আরো উপরে আয়নোস্ফেয়ারে চলো |
এখানে অতিবেগুনি রশ্মি অনু ও পরমাণুকে ভেঙে আয়ন ও ইলেক্ট্রন গঠন করে
সত্যি !!
মিরুবো, তুই কি এই সব কণা তৈরি হতে দেখতে পাচ্ছিস?
ইলেক্ট্রন
বায়ুমণ্ডলীয় পরমাণু
আয়ন
এই প্রক্রিয়া কে বলা হয় আয়নায়ন বা আয়োনাইজেশন | আয়ন ও ইলেক্ট্রন দ্বারা গঠিত এই গ্যাসকে বলে প্লাসমা |
এই কারণে এর নাম আয়নোস্ফেয়ার |
ভূপৃষ্ঠের কাছে বাতাসেও এই আয়নায়ন বা আয়োনাইজেশন হয়ে থাকে, কিন্তু ....
এখানে বাতাসের ঘনত্ব বেশি হবার জন্য,....
বিচ্ছিন্ন আয়ন ও ইলেক্ট্রনগুলির তৎক্ষণাৎ পুনর্যোজন হয় |
পুনর্যোজন
অন্যদিকে, আয়নোস্ফেয়ারে বাতাসের ঘনত্ব খুবই কম .....
তাই প্লাসমা অনেক অধিক সময় ধরে এখানে স্থায়ী হয় |

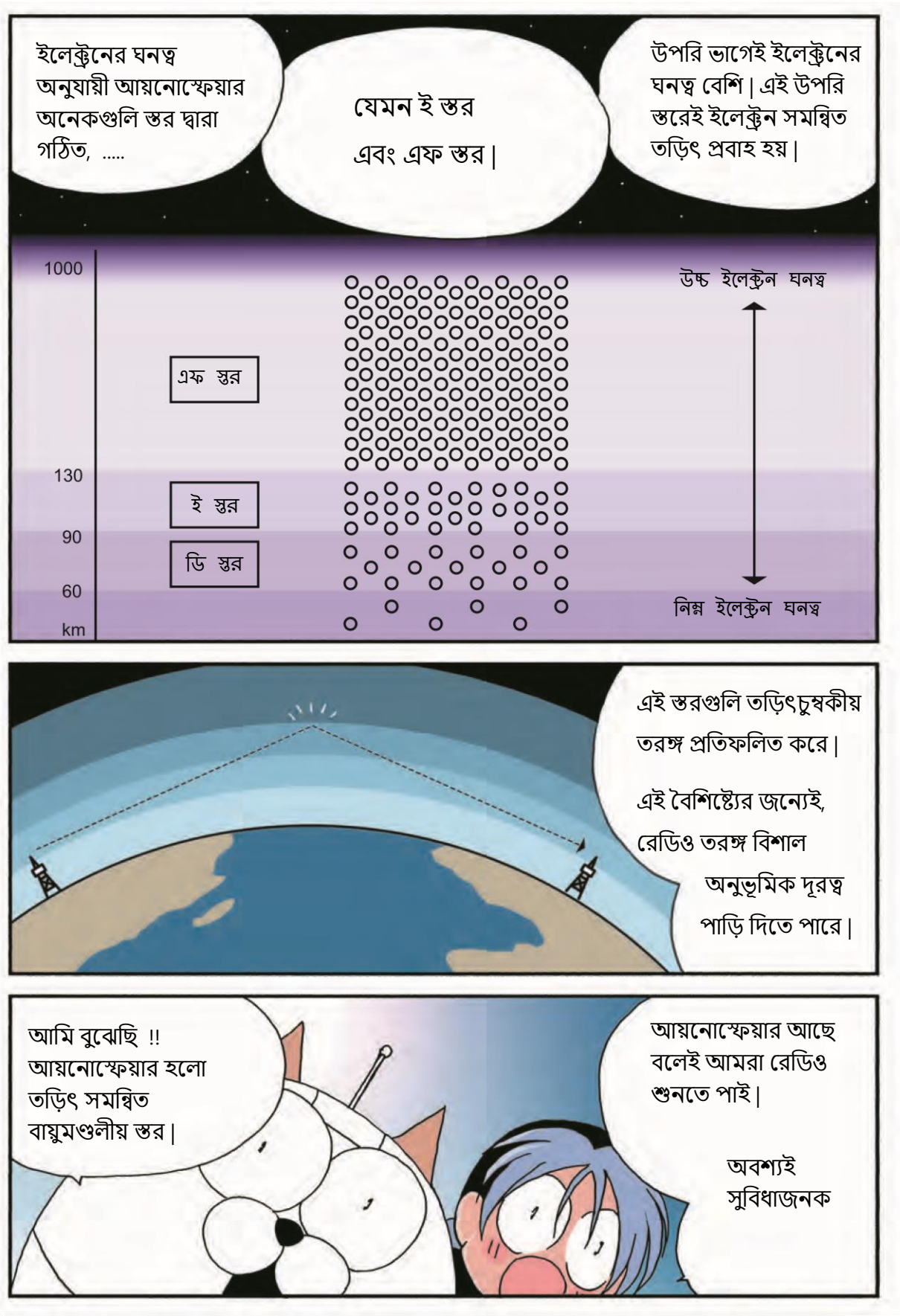
ইলেক্ট্রনের ঘনত্ব অনুযায়ী আয়নোস্ফেয়ার অনেকগুলি স্তর দ্বারা গঠিত, ...
যেমন ই স্তর এবং এফ স্তর।
উপরি ভাগেই ইলেক্ট্রনের ঘনত্ব বেশি। এই উপরি স্তরেই ইলেক্ট্রন সমন্বিত তড়িৎ প্রবাহ হয়।
1000
130
90
60
km
এফ স্তর
ই স্তর
ডি স্তর
উচ্চ ইলেক্ট্রন ঘনত্ব
নিম্ন ইলেক্ট্রন ঘনত্ব
এই স্তরগুলি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ প্রতিফলিত করে।
এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই, রেডিও তরঙ্গ বিশাল অনুভূমিক দূরত্ব পাড়ি দিতে পারে।
আমি বুঝেছি !! আয়নোস্ফেয়ার হলো তড়িৎ সমন্বিত বায়ুমণ্ডলীয় স্তর।
আয়নোস্ফেয়ার আছে বলেই আমরা রেডিও শুনতে পাই।
অবশ্যই সুবিধাজনক

রাত্রে, যখন কোনো অতিবেগুনি রশ্মি থাকে না, তখন পুনর্যোজন প্রক্রিয়া আয়নায়ন থেকে বেশি ক্রিয়াশীল।

তাই এই সময়, বাতাসে ইলেক্ট্রনের ঘনত্ব .....

... দিনের বেলার থেকে কমে যায়।

তাপমাত্রা ও বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তনের সঙ্গেও আয়নোস্ফেয়ারের পরিবর্তন হয়। এর কিছু উদাহরণ দেখা যাক।

নিরক্ষরেখার কাছে, আয়নোস্ফেয়ারের এফ স্তরে, মাঝে মাঝে কিছু বুদ্বুদ মতো গঠন তৈরি হয়।

এই গঠনের মধ্যে ইলেক্ট্রন ঘনত্ব, চারপাশের ঘনত্বের থেকে অনেক কম থাকে। তাই একে প্লাসমা বুদ্‌বুদ বলা হয়।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কাছে উচ্চ ঘনত্বের প্লাসমা গুচ্ছাকারে থাকতে দেখা যায়। এগুলি সেইসব জায়গাতেও দেখা যায় যেখানে সূর্যালোক নেই।

এগুলিকে প্লাসমার মেরু আবরণ পট্টি বলে। এগুলি পৃথিবীর দিনার্দ্ধের দিকে সৃষ্টি হয় এবং এখন থেকে মেরু আবরণের দিকে পরিবাহিত হয়।

এছাড়া প্লাসমার ইলেক্ট্রন ঘনত্ব কখনো ডোরা নক্সার মতন আকারে জাপান ও অন্যান্য দেশের উপর দিয়ে যায়।

মাধ্যম পাল্লার ভ্রাম্যমান আয়নোস্ফেরিয় ঝঞ্ঝা।

এই ইলেক্ট্রন ঘনত্বের ডোরা নকশা কখনো সুনামির মতন বায়ুমণ্ডলীয় তরঙ্গ সৃষ্টি করে, মেরু থেকে শুরু করে মধ্য ও নিম্ন অক্ষাংশ পর্যন্ত ভ্রমণ করে।

উচ্চ পাল্লার ভ্রাম্যমান আয়নোস্ফেরিয় ঝঞ্ঝা।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আয়নোস্ফেয়ারের গুরুত্ব অনেক। কিন্তু এর এই অস্থিতিশীল চরিত্রের জন্য আমাদের কৃত্তিম উপগ্রহের রেডিও তরঙ্গ মাঝে মাঝে বিঘ্নিত হয়
....যাতে টেলিযোগাযোগ ও জি.পি.এস. সিগন্যাল বিনষ্ট হয়। আয়নোস্ফেয়ারের অধ্যয়নের জন্য গবেষণা চলছে .....
....যাতে আমরা টেলিযোগাযোগ ও সঞ্চালনতন্ত্রের এই সকল সমস্যা কমিয়ে আরো উন্নত করতে পারি।
যদি আমরা এই উচ্চতায় পরীক্ষণের সব যন্ত্রাদি নিজেরা নিয়ে আসতে পারতাম, তাহলে তো খুব ভালো হতো ||
কিন্তু এই কাজটা তোমার জন্য যত সহজ মিরুবো, আমাদের জন্য নয় ...
কিন্তু কেন?
কিন্তু উপরি বায়ুমণ্ডলের সরাসরি পরীক্ষণ দুরূহ ব্যাপার।
কেন?
উচ্চ বায়ু প্রতিরোধের কারণে কৃত্তিম উপগ্রহ ৩০০ কিলোমিটারের কম উচ্চতায় উড়তে পারে না।
আবার বেলুন ও বিমান ও এতো উচ্চতায় উঠতে পারে না।
তাই এই মধ্যেকার উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের নিরীক্ষণ সহজ নয়।
কৃত্তিম উপগ্রহ
৩০০ কিলোমিটারের উপর
থার্মোসফেয়ার
আয়নোস্ফেয়ার
মেসোস্ফেয়ার
300
90
50
0
km
মানবরোহিত বেলুন
৫০ কিলোমিটারের নিচে
বিমান
২০ কিলোমিটারের নিচে

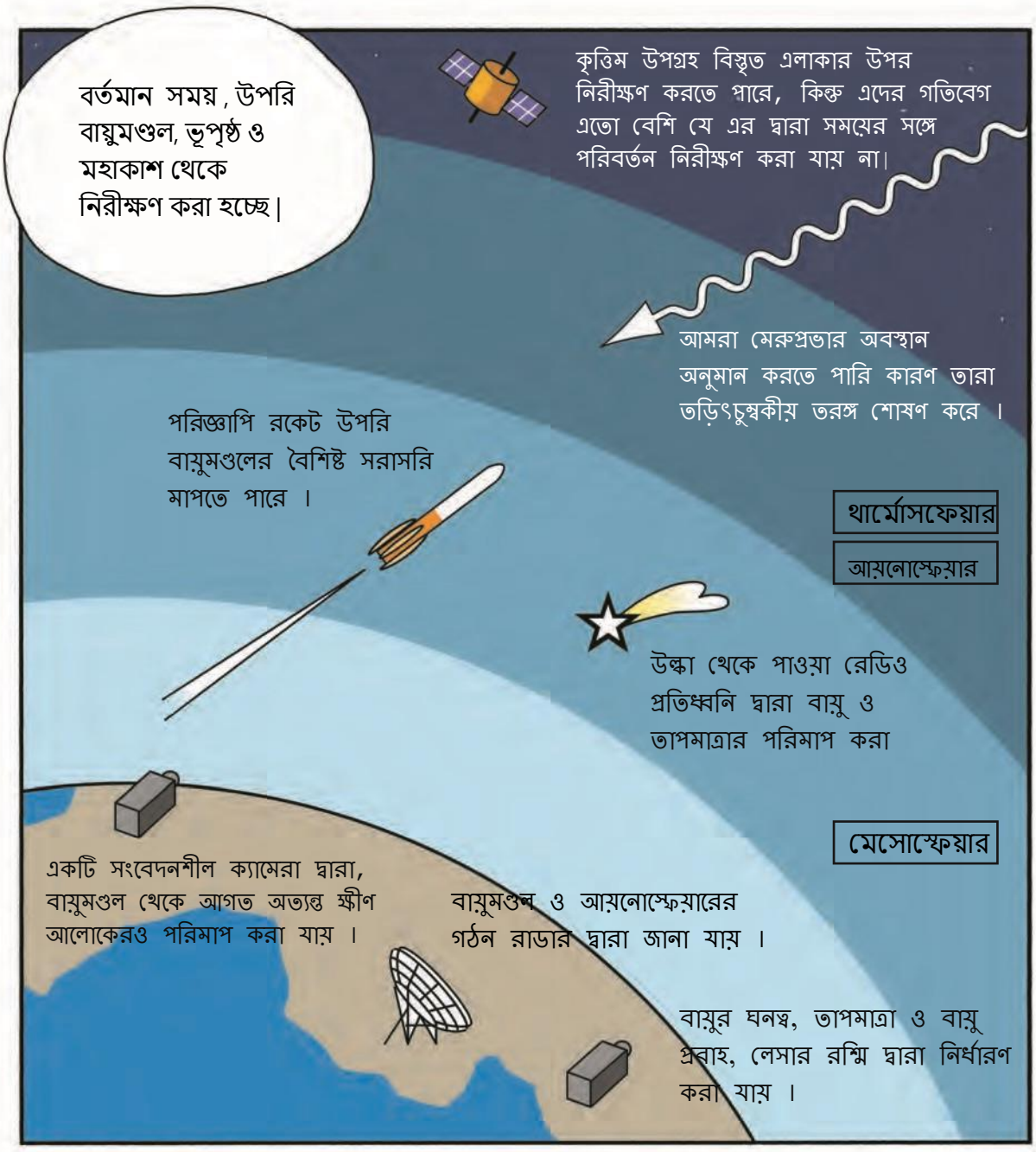
বর্তমান সময়, উপরি বায়ুমণ্ডল, ভূপৃষ্ঠ ও মহাকাশ থেকে নিরীক্ষণ করা হচ্ছে।
কৃত্তিম উপগ্রহ বিস্তৃত এলাকার উপর নিরীক্ষণ করতে পারে, কিন্তু এদের গতিবেগ এতো বেশি যে এর দ্বারা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন নিরীক্ষণ করা যায় না।
আমরা মেরুপ্রভার অবস্থান অনুমান করতে পারি কারণ তারা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ শোষণ করে ।
পরিজ্ঞাপি রকেট উপরি বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট সরাসরি মাপতে পারে ।
থার্মোসফেয়ার
আয়নোস্ফেয়ার
উল্কা থেকে পাওয়া রেডিও প্রতিধ্বনি দ্বারা বায়ু ও তাপমাত্রার পরিমাপ করা
মেসোস্ফেয়ার
একটি সংবেদনশীল ক্যামেরা দ্বারা, বায়ুমণ্ডল থেকে আগত অত্যন্ত ক্ষীণ আলোকেরও পরিমাপ করা যায় ।
বায়ুমণ্ডল ও আয়নোস্ফেয়ারের গঠন রাডার দ্বারা জানা যায় ।
বায়ুর ঘনত্ব, তাপমাত্রা ও বায়ু প্রবাহ, লেসার রশ্মি দ্বারা নির্ধারণ করা যায় ।

উপরি বায়ুমণ্ডলের সরাসরি পরিমাপ করা কঠিন হওয়া সত্বেও ....
....বৈজ্ঞানিকেরা এই অংশ নিয়ে গবেষণা করতে এতো আগ্রহী কেন?
আয়নোস্ফেয়ার সম্পর্কে তোমাদের কি বলেছিলাম মনে করো।
উপরি বায়ুমণ্ডল আমাদের জীবনে অপরিহার্য।

গবেষণায় পাওয়া গেছে যে, বৈশ্বিক উষ্মায়ণের কারণে নিম্ন বায়ুমণ্ডলের / ট্রপোস্ফেয়ারের তাপমাত্রা যেমন বাড়ছে .....
.....উপরি বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ততই কমে আসছে।
পরিগনক দ্বারা গাণিতিক অনুরূপনে দেখা গেছে, গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমান দ্বিগুন হলে, উপরি বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা অনেক কমে যায় ধরো মেসোস্ফেয়ারে ১০° আর থার্মোসফেয়ারে ৫০°।

তাই ভূপৃষ্ঠের তথ্যসমূহের চেয়ে, উপরি বায়ুমণ্ডল নিরীক্ষণ করে আমরা বৈশ্বিক উষ্মায়ণের সম্পর্কে আরো আগে জানতে পারবো।
ভুলে যেও না, এই থারমোস্ফেয়ার অঞ্চল দিয়েই মহাকাশগামী যান ও আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র পরিভ্রমণ করে।
ভবিষ্যতে মানুষ যখন মহাকাশে থাকবে, আমরা আমাদের জানালার বাইরেই প্লাসমার ঝঞ্জাবাত দেখতে পাবো|
আর আরো নীচে দেখতে পাবো সুন্দর মেরুপ্রভাকে|

শুনে বিস্ময়কর লাগছে। উপরি বায়ুমণ্ডল আমাদের কাছে আরো পরিচিত, আরো আপন হয়ে উঠবে।
এই বিষয়ে গবেষণার অগ্রগতি দেখার জন্য আমার আর তর সইছে না।

উপরি বায়ুমণ্ডল কি ?

- শিক্ষক মশায়, আমার জানার ইচ্ছা যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে দেখতে কেমন লাগে।

- আমারও। বায়ুমণ্ডলের উপরে কি স্পষ্ট একটা ছাদ দেখা যায়?

- না তা একেবারেই নয় । এটা উপরি বায়ুমণ্ডলের পর একটা বিশাল এলাকা । যেহেতু বহির্মহাকাশে কোনো বাতাস নেই, তাই উপরি বায়ুমণ্ডলকে পৃথিবী আর মহাকাশের সীমান্ত বা বায়ুমণ্ডলের ছাদ বলা হয়।

- যখন আপনারা 'উপরি বায়ুমণ্ডল' বলেন, তখন বায়ুমণ্ডলকে ঠিক কিভাবে বিভাজন করেন?

- খুব ভালো প্রশ্ন, মোল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উচ্চতায় মাত্র কয়েকশো কিলোমিটার । পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় এই বেধ খুবই সামান্য। ঠিক যেন পৃথিবীর চারপাশে জড়ানো এক পাতলা পর্দা। তা সত্বেও, খুব কাছ থেকে দেখলে এরই মধ্যে, বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট দেখা যাবে।

- তা তো বুঝলাম। তাহলে উপরি বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্টগুলি কি ?

- সর্বপ্রথমে বলি, উপরি বায়ুমণ্ডলে একটি স্তর আছে যার নাম আয়নোস্ফেয়ার । এখানে বায়ুস্তর আংশিক ভাবে আধানিত । এই আয়নোস্ফেয়ার পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ প্রতিফলিত করে। এই আচরণের সাহায্যে আমরা উপরি বায়ুমণ্ডলকে পর্যবেক্ষন করে থাকি।

- কিন্তু বায়ুমণ্ডলে তড়িৎ আধান কেন থাকে ?

- সূর্য থেকে বিকিরিত অতিবেগুনি রশ্মি আর মহাকাশ থেকে আগত প্লাসমা, অনু আর পরমাণুর চারপাশে আবৃত্ত ইলেক্ট্রনগুলিকে অপসারিত করে বাতাসে তড়িৎ আধান সৃষ্টি করে। আয়নোস্ফেয়ারে বাতাসের ঘনত্ব কম থাকার দরূন, মুক্ত ইলেক্ট্রন দ্বারা এই আধানে পুনঃসংযোজিত হতে অনেক সময় লাগে। এই কারণে, এখানকার বাতাস এখানে সৃষ্ট আধান অনেক্ষন ধরে রাখতে পারে।

- শিক্ষক মশায়, আমরা এই বিদ্যুৎ কি কোনো কাজে লাগাতে পারি ? যেমন ধরুন ইলেকট্রিক চুল্লিতে রান্না করার জন্য ?

- তুমি যদি উপরি বায়ুমণ্ডলের সব তাড়িত আধান জড়ো করতে পড়তে তাহলে তুমি তা বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ব্যবহার করে অনেক অনেক সময় ধরে রান্না করতে পারতে।

- আচ্ছা, আয়নোস্ফেয়ার সম্পর্কে পড়াশোনা করে আমাদের লাভ কি ? এর কোনো প্রভাব কি আমাদের উপর পড়ে ?

- আয়নোস্ফেয়ারের পরিবর্তনশীলতার কারণে, স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা , জি.পি.এস এবং রেডিও / টেলিভিশন সম্প্রচার ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আয়নোস্ফেয়ারকে আরো দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য, এর সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন।

- তাহলে তো তোর জন্য চিন্তার ব্যাপার, মিরুবো। জি.পি.এস ছাড়া তো তোর তো কোনো দিকজ্ঞান থাকে না, আর তুই কোনো কাজও ঠিক ভাবে করতে পারিস না।

- না, ঠিক তা নয় । আমার ভিতরের নিখুঁত কম্পিউটার অত্যন্ত সূক্ষ্য গণনা করতে সক্ষম। কিন্তু কোনো কোনো সময় শুধু দিক নির্ণয়ের জন্য ওটার সূক্ষ্যটা একটু বেশিই হয়ে পড়ে।

- শোনো বাচ্চারা, উপরি বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে নেয়। আর তোমাদের ও জানা ভালো যে, মেরু অঞ্চলে যে মেরুপ্রভা দেখা যায়, তাও এই উপরি বায়ুমণ্ডলের উচ্চতাতেই সৃষ্টি হয়।

- মেরুপ্রভা শুধুমাত্র মেরু অঞ্চলেই দেখা যায়, তাই না ?

- হাঁ, মূলত তাই। কিন্তু যখন কোনো ভূচৌম্বকীয় ঝড় তৈরি হয়, তখন এই মেরুপ্রভা অনেক নিচের অক্ষ্যাংশ থেকেও দেখা যেতে পারে।

- তাহলে জাপান থেকে মেরুপ্রভা দেখার কোনো সম্ভাবনা আছে কি ?

- গত ১০ বছরে, প্রায় ২০ বার অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্রের দ্বারা জাপান থেকে মেরুপ্রভা পর্যবেক্ষণ করা গেছে। যদিও এর মধ্যে তা খালি চোখে দেখার মতো তাদের উজ্জ্বলতা ছিল মাত্র ২ বার।

- আমি তো জাপানে একবার মেরুপ্রভা নিজের চোখে দেখতে চাই। এর জন্য আমি যতদিন পারি আকাশের দিকে নজর রেখে যাবো। কিন্তু তোমার পক্ষে ইটা করা সম্ভব নয়, মোল। কারণ তোমাকে তো ঘুমোতেও হবে।

- এটা তো ঠিক নয়।

উপরি বায়ুমণ্ডলে ডোরা ডোরা দাগ

উপরি বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত ক্ষীণ আলোক নিঃসরণ করে, যাকে বলা হয় 'এয়ার গ্লো' | এই আলো খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না | এই দুর্বল আলোকের দ্বিমাত্রিক ছবি তোলা সম্ভব শুধুমাত্র অত্যন্ত সংবেদনশীল শীতলীকৃত সি. সি. ডি. ক্যামেরার দ্বারা | এই উপায়ে, বর্তমানে উপরি বায়ুমণ্ডলে অভিকর্ষ তরঙ্গ আর প্লাসমা বুদ্‌বুদ দ্বারা তৈরি বিভিন্ন নকশা পর্যবেক্ষন করা সম্ভব | বিজ্ঞানের এই শাখায় অগ্রগতি এখন তুঙ্গে |

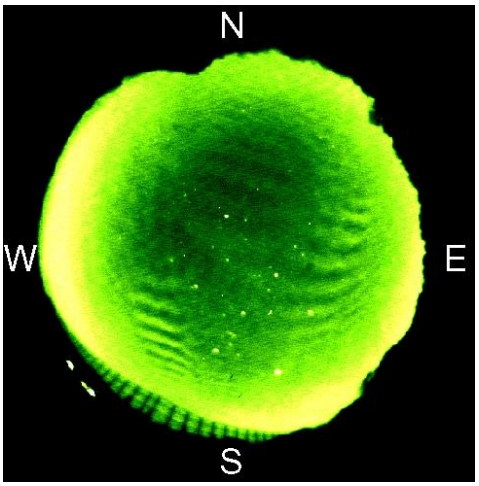

২০-৩০ কিলোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ডোরা, উপরি বায়ুমণ্ডলে অভিকর্ষ তরঙ্গের উপস্থিতি প্রদর্শন করে | ৫৫৭.৭ ন্যানোমিটার (সবুজ) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এই পূর্নাম্বর চিত্র, জাপানের সিগারাকিতে অবস্থিত কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ইউ মানমন্দিরে তোলা | ১০৫ সেকেন্ড এক্সপোজার সময়ে তোলা এই ছবি, ৯০-১১০ কি.মি উচ্চতায় (উপরি মেসোস্ফেয়ার) অবস্থিত অক্সিজেন পরমাণুর নিঃসরণ থেকে তৈরি |

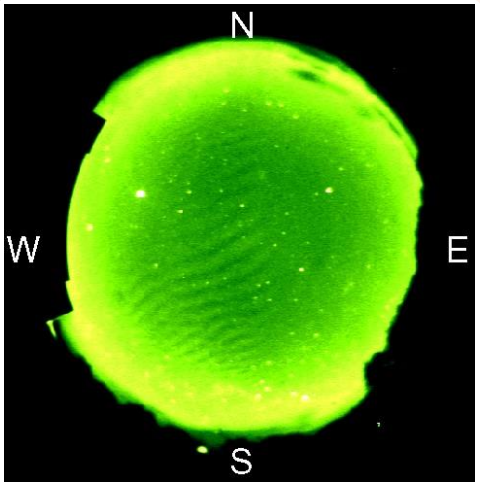

২০ - ৩০ কিলোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ডোরা, উপরি বায়ুমণ্ডলে অভিকর্ষ তরঙ্গের উপস্থিতি প্রদর্শন করে | ৫৫৭.৭ ন্যানোমিটার (সবুজ) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এই পূর্নাম্বর চিত্র, ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের কততাবাং-এ তোলা | ১০৫ সেকেন্ড এক্সপোজার সময়ে তোলা এই ছবি, ৯০ - ১১০ কিলোমিটার উচ্চতায় (উপরি মেসোস্ফেয়ার) অবস্থিত অক্সিজেন পরমাণুর নিঃসরণ থেকে তৈরি |

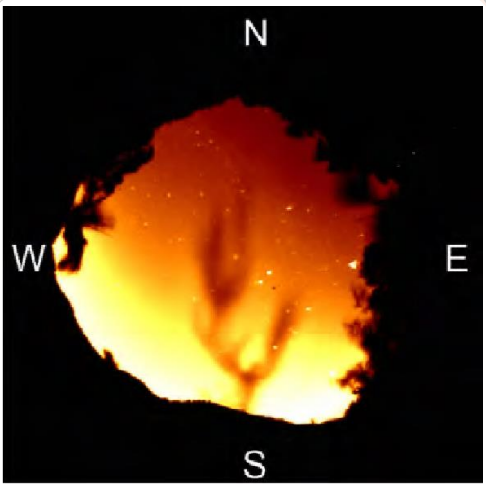

উপরি বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত প্লাসমা বুদ্‌বুদের চিত্র (দেখে মনে হয় যেন কোনো গাছের শাখা প্রশাখা) | ৬৩০ ন্যানোমিটার (লাল) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এই পূর্নাম্বর চিত্র, জাপানের কোগোশিমায় অবস্থিত সোলার-টেরেস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্ট ল্যাবরেটরি-র সাটা স্টেশন-এ তোলা | ১৬৫ সেকেন্ড এক্সপোজার সময়ে তোলা এই ছবি, ২০০ - ৩০০ কিলোমিটার উচ্চতায় (আয়নোস্ফেয়ার) অবস্থিত অক্সিজেন পরমাণুর নিঃসরণ থেকে তৈরি |

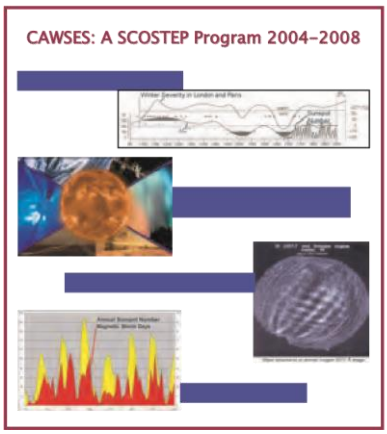

সূর্য ও পৃথিবীর সম্মিলিত তন্ত্রের আবহাওয়া ও জলবায়ু (CAWSES)

CAWSES হলো SCOSTEP প্রযোজিত একটি আন্তর্জাতিক কার্যক্রম। মহাকাশ ও তার পরিবেশ এবং আমাদের জীবন ও সমাজে তার প্রভাবের ব্যাপারে আমাদের বোধ উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নত করার লক্ষ্যে এটি স্থাপিত হয়। CAWSES এর প্রধান কার্যাবলী হলো, এই বোধ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষন, মডেল তৈরি ও তত্ব গঠনে আন্তর্জাতিক কার্যাবলী সম্পাদনে সাহায্য করা। সেই সঙ্গে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈজ্ঞানিকদের এই কাজে বিজড়িত করা ও সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা। CAWSES এর কার্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন, ম্যাসাচুসেটস-এ অবস্থিত বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে। CAWSES এর বিজ্ঞান বিষয়ক চারটি মূল প্রসঙ্গ ছবিতে দেখানো আছে।

http://www.bu.edu/cawses/
http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SCOSTEP/scostep.html

সোলার টেরেস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্ট ল্যাবরেটরি (STEL) নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়

জাপানে STEL পরিচালিত হয় আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় সমবায় পদ্ধতি দ্বারা। এর উদ্দেশ্য, জাপানে এবং অন্যান্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়, সৌর-ভৌম তন্ত্রের গঠন ও পরিবর্তনের উপর গবেষণাকে আরো উন্নীত করা । এই গবেষণাগার চারটি বিভাগে ভাগ করা: বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ, আয়োনোস্ফেরিক ও চৌম্বকীয় পরিবেশ, হেলিওস্ফেরিক পরিবেশ এবং সমন্বিত পঠন বিভাগ । জিওস্পেস রিসার্চ সেন্টারও, যৌথ গবেষণা প্রকল্পগুলি সমন্বয় ও উন্নীত করার উদ্দেশ্যে, এই গবেষণাগারের সঙ্গে সংসৃষ্ট । দেশব্যাপী বিন্যস্ত এর সাতটি মানমন্দির / পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে, বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক সত্বার, ভুস্থলভিত্তিক পর্যবেক্ষণ করা হয় ।
http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/

はやのん

হায়ানন : রিওক্যু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হায়ানন একযোগে এক লেখক ও কার্টুনিস্ট । বিজ্ঞান ও কম্পিউটার-গেমস এ তার গভীর ব্যুৎপত্তির ভিত্তিতে তিনি বিভিন্ন জনপ্রিয় পত্রিকায় প্রচুর ধারাবাহিক-এ তার অবদান রেখেছেন । তার সামঞ্জস্যপূর্ণ লিখনি শৈলীতে প্রত্যক্ষিত তার বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা আজ সর্বজনবিদিত ।

http://www.hayanon.jp/

子供の科学

কোডোমো নো কাগাকু (ছোটদের জন্য বিজ্ঞান) : সেইবুন্দ শিনকশা প্রকাশনা সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত, কোডোমো নো কাগাকু, ছোটদের জন্য প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা । ১৯২৪ সালে প্রকাশিত এর প্রথম সংস্করণের থেকেই এই পত্রিকাটি বিজ্ঞান শিক্ষার পরিষেবায় নিয়োজিত । এই পত্রিকায়, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানভিত্তিক ঘটনা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম গবেষণা বিষয়, ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় ।

http://www.seibundo.net/